আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর গুণাবলী

صفات الداعية إلى الله تعالى

< Bengali - بنغالي - বাংলা >

আব্দুস শহীদ নাসিম

عبد الشهيد نسيم

সম্পাদক: মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مراجعة: محمد شمس الحق صديق

د/ أبو بكر محمد زكريا

আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর গুণাবলী

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣﴾ [فصلت: ٣٣]

“ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো আর ঘোষণা করলো: ‘আমি একজন মুসলিম।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৩]

এ আয়াতের পূর্ণ গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে একথা মনে রাখতে হবে যে, এ আয়াত মক্কার কঠিন বিরোধিতার পরিবেশে নাযিল হয়েছে। এটা ছিল সেই মর্মান্তিক অধ্যায়, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। সে পরিবেশে একথা বলা এবং ঘোষণা করা কোনো সহজ ব্যাপার ছিল না যে, ‘আমি একজন মুসলিম’। এরূপ অবস্থা ও পরিবেশে প্রথম কথা এটা বলা হলো যে, সে ব্যক্তির কথাই সর্বোত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে। অন্য কথায় একজন সত্য পথের দাওয়াত দানকারীর বৈশিষ্ট্যই এটা যে তার দাওয়াত হবে আল্লাহর দিকে। তার সামনে কোনো প্রকার পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না। দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্যই তার মনের কোণে স্থান পেতে পারবে না। যে ব্যক্তি খালেছভাবে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, কুরআন মাজীদের শিক্ষা অনুযায়ী এমন আহ্বানকারীর প্রথম বৈশিষ্ট্য এটাই হতে হবে যে, তিনি আল্লাহর একত্বের (তাওহীদের) প্রতি দাওয়াত দিবেন। তাকে এভাবে আহ্বান করতে হবে: হে মানুষ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব, আনুগত্য বা উপাসনা করবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু পাওয়ার লোভ ও কামনা করবে না। কেবল আল্লাহর হুকুম ও নির্দেশসমূহের আনুগত্য করো। কেবল তাঁর বিধানেরই অনুসরণ করো।

পৃথিবীতে মানুষ যে কাজই করে সে একথা চিন্তা করেই করে যে, আমি কার গোলামী ও আনুগত্য করছি এবং কার নিকট জবাবদিহি করতে হবে? মানুষের সকল তৎপরতা ও চেষ্টা সাধনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হওয়া চাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গঠনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ লাভ।

দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, হক পথের দাওয়াত দানকারীকে আমলে সালেহর সৌন্দর্যে সুশোভিত হতে হবে। তাকে নেক আমল করতে হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে দাওয়াত দানকারীর নিজের আমলই যদি দুরস্ত না হয়, তবে তার দাওয়াতের আর কোনো প্রভাবই থাকে না। তা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যে জিনিসের প্রতি লোকদেরকে দাওয়াত দিবেন তার নিজেকেই প্রথমে সে জিনিসের প্রতি আমলকারী হতে হবে। তার নিজের জীবনে আল্লাহর নাফরমানীর এতটুকু বিচ্যুতিও যেনো পাওয়া না যায়। তার নৈতিক চরিত্র এমন হতে হবে যেন কোনো ব্যক্তি তাতে একটি দাগও খুঁজে না পায়। তার আশপাশের পরিবেশ, তার সমাজ, তার বন্ধু বান্ধব, তার আপনজন ও আত্মীয় স্বজন যেন একথা মনে করে যে, আমাদের মধ্যে এক উচ্চ ও পবিত্র চরিত্রের ব্যক্তি রয়েছেন।

কুরআনে কারীমের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতেও আমরা হুবহু এ একই শিক্ষা পাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হায়াতে তাইয়েবা সাক্ষ্য দেয় যে, যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে দীনে হকের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন, তখন সেই সমাজ যাদের মধ্যে তিনি জীবনের চল্লিশটি বছর

অতিবাহিত করেন, তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও ছিল না, যে তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রবক্তা এবং প্রশংসাকারী ছিলো না। যে ব্যক্তি তাঁর যত নিকটে অবস্থান করছিলো, সে ততো বেশী তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলো। যে লোকগুলো থেকে তাঁর জীবনের কোনো একটি দিকও গোপন ছিলো না, তারাই সর্বপ্রথম তাঁর নবুওয়াতের স্বীকৃতি দান করেন।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা:

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বিগত পনেরোটি বছর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাম্পত্য জীবনের একান্ত সঙ্গী ছিলেন। তিনি কোনো কমবয়েসী মহিলা ছিলেন না; বরঞ্চ বয়সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ছিলেন অনেক বড়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের কালে তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর। এরূপ একজন বয়স্কা, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারীণী মহিলা যিনি বিগত পনেরোটি বছর স্বামী হিসেবে আড়ালবিহীন নিকট থেকে তাঁকে দেখেছেন, স্বামীর কোনো দোষত্রুটি তাঁর কাছে গোপন থাকতে পারে না। কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কোনো স্ত্রী তার স্বামীর না-জায়েয কাজে শরীক হতে পারে বটে; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই একথা মানতে পারেন না যে, ইনি নবী হতে পারেন কিংবা তাঁর নবী হওয়া উচিৎ। পক্ষান্তরে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এতো অধিক বিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি যখন নবুওয়াত লাভের ঘটনা তাঁর নিকট বর্ণনা করেন, তখন একটি মুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা না করে দ্বিধাহীনচিত্তে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু:

একেবারে নিকট থেকে যারা তাঁকে জানতেন, তাদেঁর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন যায়েদ ইবন হারেছা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। একজন গোলাম হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংসারে তাঁর আগমন ঘটে। পনেরো বছর বয়সে তিনি এ ঘরে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তিকালে তাঁর বয়স ছিলো ত্রিশ বছর। অর্থাৎ গোটা পনেরটি বছর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে থেকে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার ও বুঝার সুযোগ তাঁর হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাঁর ধারণা একটা ঘটনার মাধ্যমে আরো পরিস্কার হয়ে ওঠে। ঘটনাটা হচ্ছে, ছোট বেলায় পিতা-মাতা থেকে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। তাকদীরের লিখন তাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তাঁর বাপ-চাচারা যখন জানতে পারলো আমাদের সন্তান অমুক স্থানে গোলামীর জীবন যাপন করছে, তখন তারা মক্কায় এলো। এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নবুওয়াত লাভের আগেকার ঘটনা। তারা এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো: 'আমাদের ছেলেটাকে যদি আযাদ করে দেন, তবে এটা আমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবাণী হবে'।

তিনি বললেন: 'আমি ছেলেকে ডাকছি। সে যদি আপনাদের সাথে যেতে চায় তবে আমি তাকে আপনাদের সাথে দিয়ে দেবো। আর সে যদি আমার কাছে থাকতে চায়, তবে আমি এমন লোক নই যে, কেউ আমার কাছে থাকতে চাইবে আর আমি জোরপূর্বক তাকে দূরে ঠেলে দেবো'।

তাঁর এ জবাবে তারা বললো, আপনি বড়ই ইনসাফের কথা বলছেন। আপনি যায়েদকে ডেকে ব্যাপারটা জেনে নিন। তিনি যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। যায়েদ যখন সামনে উপস্থিত হলো, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকদের চেনো? যায়েদ বললেন: 'জী-হ্যাঁ! এরা আমার আব্বা এবং চাচা'। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'এরা তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। তুমি যদি যেতে চাও আনন্দের সাথে যেতে পারো'।

তাঁর পিতা এবং চাচাও একই কথা বলল, আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। জবাবে যায়েদ ইবন হারেছা বললেন, 'আমি এ ব্যক্তির মধ্যে এমন সব সুন্দর গুণাবলী দেখেছি, যা দেখার পর আমি তাকে ছেড়ে বাপ-চাচা এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরে যেতে চাই না'।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সম্পর্কে এ ছিলো তাঁর খাদেমের সাক্ষ্য। একজন মনিবের প্রতি তার খাদেম কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে; কিন্তু এতো বেশী ভক্ত ও অনুরক্ত হতে পারে না যে মনিবের প্রতি ঈমান আনবে। ঈমান আনার জন্যে মনিবের মধ্যে এমন উন্নত স্বভাব, সদাচার, পবিত্রতা এবং উচ্চ নৈতিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটতে হবে, যা দেখে খাদেম যেনো দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয় যে, আমার মনিব সত্যিই নবী। একথাও মনে রাখতে হবে যে, যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কোনো মামুলী যোগ্যতার অধিকারী লোক ছিলেন না। মদীনায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম হবার পর তাকে বহু যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর চরিত্র সম্পর্কে এ সাক্ষ্য এমন যোগ্য ব্যক্তিরই সাক্ষ্য।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু:

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নবুওয়াত লাভের বিশ বছর পূর্ব থেকে একজন প্রগাঢ় বন্ধু হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার এবং জানার সুযোগ পেয়েছেন। তাদের বন্ধুত্ব ছিলো, তাদের একজন ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অপরজন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। একজন বন্ধু আর একজন বন্ধুকে খুবই পছন্দ করে থাকেন। মনের কথা তার কাছে বলেন; কিন্তু এমন ভক্ত কখনো হতে পারে না যে, তাকে নবী বলে মেনে নিবেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক নির্দ্বিধায় তাঁর নবুওয়াতের স্বীকৃতি দান -এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, কুড়ি বছরের সুদীর্ঘ সময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র চরিত্র, সুউচ্চ স্বভাব ও আচরণের প্রতিচ্ছবি হিসেবে পেয়েছিলেন। তবেই তো তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর নবুওয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং ঘোষণা করেন, এমন উন্নত স্বভাব চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই নবী হতে পারেন এবং তাঁর নবী হওয়া উচিতও বটে।

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু:

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু–এর নাম আমি প্রথমে এজন্যে উল্লেখ করি নি যে, তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ঘরেই প্রতিপালিত হয়েছেন। কিন্তু দশ বছরের বালকও যে ঘরে থাকে, যার কাছে থাকে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সেও ওয়াকিফহাল থাকে। বিশেষ করে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মতো মেধাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কম বয়সের হলেও তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি তাঁর স্নেহ, সীমাহীন পবিত্র চরিত্র এবং সুউচ্চ স্বভাব ও মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফ ছিলেন। আমলে সালেহ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ উদাহরণসমূহ দ্বারা একথা পরিষ্কার হলো যে, কোনো ব্যক্তি যে জিনিসের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবে, তার জীবনটাকেও হুবহু সে দাওয়াতের মাপকাঠিতে তৈরী করতে হবে, তার ব্যক্তি জীবন হতে হবে তার দাওয়াতের বাস্তব সাক্ষ্য ও প্রতিচ্ছবি। তাকে এমন পূর্ণ-চরিত্র, উচ্চ স্বভাব ও আচরণের অধিকারী হতে হবে -দাওয়াত ইলাল্লাহর আওয়াজ নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলে যেন তার কথায় লোকেরা প্রভাবিত হয় এবং তার আমল যেনো তার দাওয়াতের সাক্ষ্য বহন করে, আর মানুষ যেন একথা স্বীকার করে নেয় যে, এ ব্যক্তির কথা সত্য না হয়ে পারে না। লোকেরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করুক আর না-ই করুক; কিন্তু তারা যেন একথা স্বীকার

করতে বাধ্য হয় যে, এ ব্যক্তি যা কিছু বলছে, আন্তরিকতার সাথেই বলছে, এ মতবাদ, এ নীতি ও দাওয়াতই তার জীবন বিধান। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটতম দুশমন আবু জেহেলও একবার বলেছিলো: "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমরা তো তোমাকে মিথ্যা বলছি না। আমরা তো ঐ দাওয়াতকে মিথ্যা বলছি যা তুমি নিয়ে এসেছো।" অর্থাৎ নিকৃষ্টতম দুশমনও তাঁর সত্যবাদিতার প্রবক্তা ছিলো। এটাই হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা, স্বভাব ও আচরণের উচ্চতা।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছেঃ এবং সে ঘোষণা করে আমি একজন মুসলিম।

এ কথার তাৎপর্য বুঝার জন্যে মক্কার সেই পরিবেশকে সম্মুখে রাখতে হবে যা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি। নবুওয়াতের সে অধ্যায়ে কোনো ব্যক্তির এ ঘোষণা দেয়া যে 'আমি একজন মুসলিম' সহজ ও মা'মুলি ব্যাপার ছিলো না; বরং এটা ছিল হিংস্র পশুদেরকে নিজের ওপর হামলা করার আহ্বানের নামান্তর। এখানে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দানকারীর এ বৈশিষ্ট্য পরিস্কার হলো যে, তিনি কেবল আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীই নন, কেবল পবিত্র আমলের অধিকারীই নন; বরং তিনি নিকৃষ্টতম শত্রুদের সম্মুখে এবং চরম বিরুদ্ধবাদী পরিবেশেও নিজের মুসলিম হবার কথা অস্বীকার করেন না, লুকিয়ে রাখেন না। নিজের মুসলিম হবার কথা স্বীকার করতে এবং তার ঘোষণা দিতে কোনো লজ্জা, সংকোচ ও ভয় ভীতির পরোয়া করেন না। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেন, 'হ্যাঁ, আমি মুসলিম, যার যা ইচ্ছা করুক'। অন্য কথায় দীনে হকের দাওয়াত দানকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ এটা হতে হবে যে, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও বাহাদুর ব্যক্তি হবেন। আল্লাহর পথে ডাকা কোনো ভীরু কাপুরুষের কাজ নয়। সামান্য চোটেই যে ভেঙ্গে পড়ে, এমন ব্যক্তি কখনো মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে পারে না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার যোগ্যতা রাখে, যে কঠিনতম শত্রুতার পরিবেশ, বিরুদ্ধতার পরিবেশ এবং মারাত্মক বিপজ্জনক পরিবেশেও ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে দণ্ডায়মান হবার সৎসাহস রাখে এবং পরিণামের কোনো পরোয়াই করে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এরূপ বাহাদূরীর বাস্তব ও পরিপূর্ণ নমুনা ছিলেন। মক্কার ঘোরতর পরিবেশে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত পেশ করেছেন। সত্যের সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেই সব লোকদের মধ্যেই এ আন্দোলনকে জারী রেখেছিলেন, যারা ছিলো তাঁর খুনের পিয়াসী এবং যারা তাকে, তাঁর সাহাবীদেরকে চরম অত্যাচার ও নির্যাতনে কোনো প্রকার কার্পণ্য করে নি। এ ঘোরতম বিরুদ্ধতা, নির্যাতন ও মুসীবতের পরিবেশেও তিনি একাধারে তের বছর যাবৎ দাওয়াত পেশ করেছিলেন। অতঃপর মদীনায় পৌঁছার পর যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যেসব ভয়াবহ লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়, তাতেও তাঁর কদম কখনো পিছে হটে নি। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিমরা যখন পরাজয়ের প্রায় মুখোমুখি হয়ে পড়ে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তখন যুদ্ধের ময়দানে কেবল নিজস্থানে শুধু অটলই ছিলেন না; বরং সম্মুখে শত্রুদের সারির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং তিনি যে কে সে কথাও গোপন রাখেন নি। তিনি বলছিলেন:

"মিথ্যার লেশ নেই আমি নবী মহা-সত্য জেনে রাখো আমি আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র"

এ ঘোষণা তিনি যুদ্ধের ময়দানের এমন পরিবেশে দিচ্ছিলেন, যখন তিনি শত্রুদের ছোবলের আওতায় অবস্থান করছিলেন এবং সাথে মাত্র ২/৩ জন সাথীই বাকী ছিলো। সে সময়ও তাঁর 'আমি নবী' এ ঘোষণা দ্বারা পরিস্কাভাবে বুঝা যায় -দায়ী ইলাল্লাহকে এমনিই সাহসী ও বাহাদুর হতে হবে। যদি দাওয়াত দানকারী হিম্মত, দৃঢ়তা ও বাহাদুরীর মতো গুণাবলীর অলংকারে ভূষিত না হয়, তবে সে এ পথে পা বাড়াবার যোগ্যতাই রাখে না। যদি পা বাড়ায়ও তবে সে তার ভীতি ও দুর্বলতার কারণে উল্টো গোটা কর্মসূচীর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সমাপ্ত